কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৪...

রাজশাহী ছোটমণি নিবাস

অনাথ শিশুদের খাবারে পেট ভরছে কর্মচারীদের

রফিকুল ইসলাম, রাজশাহী ▷

রাজশাহী ছোটমণি নিবাসে বাস করে কোমলমতি অনাথ শিশুরা। কিন্তু নানা-অব্যবস্থাপনার কারণে এখানকার শিশুরা অযত্ন-অবহেলার শিকার হচ্ছে। খাদ্য, শিক্ষা ও আবাসের মতো মৌলিক চাহিদা থেকে তারা বঞ্চিত। অভিযোগ রয়েছে, এখানে বাস করা শিশুরা ঠিকমতো খাবার পর্যন্ত পায় না। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার দিয়ে পেট ভরছে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের। ফলে অনাহার-অর্ধাহারে জীবন কাটছে শিশুদের। অপুষ্টিসহ নানাবিধ সমস্যায় তারা পিছিয়ে পড়ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৮১ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রাজশাহী নগরীর বর্ণালীর মোড় এলাকায় গড়ে তোলা হয় ছোটমণি নিবাস। ১০০টি আশ্রয়হীন শিশুর জন্য এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। তবে কখনোই ৫০টির বেশি শিশুকে রাখা যায়নি। আবাসন সংকট, পরিচর্যাকারী না থাকা এবং পর্যাপ্ত বাজেট না পাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিশুদের আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, প্রতিষ্ঠানটি এমনিতেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর পরও শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য ও পোশাকের অর্থ ভাগবাটোয়ারা করেন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঠিকাদার। একটি শিশুর জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় তার বেশির ভাগ চলে যায় তাঁদের পকেটে। ফলে অধিকাংশ সময় পেটভরে খেতে পায় না শিশুরা। স্থানীয় একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, এখানকার শিশুদের নিম্ন ও অল্প পরিমাণ খাবার দেয় ঠিকাদারের লোকজন। পক্ষান্তরে খাবারের বেশি অংশ বিতরণ করা হয় এখানকার কর্মচারীদের জন্য। এ ছাড়া ঠিকাদারের এমন অনিয়ম নিয়ে কেউ তদারকি করে না। আবার বছরে দুইবার পোশাকের জন্য যে বরাদ্দ তা ঠিকমতো ব্যয় করা হয় না।

সূত্র মতে, রাজশাহীর এক শ্রেণির ব্যক্তি শিশুদের জন্য অর্থ সহায়তা করে থাকেন। তাঁরা ঈদে নতুন পোশাক কিনে দেন। এ ক্ষেত্রে সেসব পোশাককে প্রতিষ্ঠানের পোশাক বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। আর নির্ধারিত ঈদ বরাদ্দের অর্থ হয় লুটপাট।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, রাজশাহী ছোটমণি নিবাসে বর্তমানে শিশুর সংখ্যা ২৮। এসব শিশুকে আনা হয়েছে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কারাগার, পুলিশ দ্বারা উদ্ধার হওয়া এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে। তাদের বেশির ভাগই মা-বাবাহীন অনাথ শিশু। তাদের প্রত্যেকের বয়স সাত বছরের নিচে। সাত বছর পার হলেই তাদের পাঠানো হয় সেফ হোম অথবা অন্য কোনো শিশু বিকাশকেন্দ্রে। সাত বছর বয়স পর্যন্ত লালনপালন করা হয় ছোটমণি নিবাসে।

সূত্র আরো জানায়, এই ছোটমণি নিবাসে শিশুদের লালনপালনের জন্য নিয়োগকৃত মাত্র একজন আয়া রয়েছেন। আরেকজনকে আনা হয়েছে ডেপুটেশনে। ফাঁকা রয়েছে একটি আয়ার পদ। আবার প্রয়োজনীয় পরিমাণ জনবল না থাকায় এবং জায়গা সংকুলান না হওয়ায় এখানে ৫০টি শিশু কখনোই রাখা যায়নি। অন্যদিকে ২০০৩ সালে ছোটমণি নিবাসটি ১০০টি শিশুর জন্য শিশু পরিবারে রূপান্তর করার একটি প্রকল্প সরকার হাতে নিলেও সেটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ ১০০ শিশু পরিবারের জন্য আসা আসবাবপত্র ব্যবহৃত হয়েছে অন্য কাজে। কিছু নষ্ট হয়েও গেছে। এ ছাড়া একজন এমবিবিএস চিকিৎসকের পদ থাকলেও সেটি শূন্য হয়ে আছে। ফলে চিকিৎসার কাজটি করে থাকেন একজন প্যারামেডিকস কম্পাউন্ডার। এতে এখানকার শিশুদের একটু জটিল কোনো কিছু হলেই রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়।

সূত্র মতে, প্রতি মাসে প্রত্যেক শিশুর জন্য খাবার বাবদ দুই হাজার টাকা বরাদ্দ দেয় সমাজসেবা অধিদপ্তর। আর শিক্ষা ও কাপড়ের জন্য বছরে দেওয়া হয় ৬০০ টাকা করে। কিন্তু এসব অর্থের বেশির ভাগই হয় লুটপাট। ফলে এখানকার অনাথ শিশুরা অনেকটা অযত্ন-অবহেলার মধ্যেই বড় হচ্ছে। এতে শিশুদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন মাত্র ২৮-এ দাঁড়িয়েছে। অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার কারণেই এখানে নতুন করে শিশু দিতে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে বলেও অভিযোগ করেছে স্থানীয় লোকজন।

স্থানীয় লোকজন আরো জানায়, বাইরে থেকে এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় শিশুদের জন্য গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কী হচ্ছে—কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। আর সেই সুযোগে শিশুদের নামে আসা বরাদ্দগুলোও খুব সহজেই লুটপাট করতে পারেন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঠিকাদার। এসব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষক ফোনে জানান, ছোটমণি নিবাসের উপতত্ত্বাবধায়ক মাকসুদা খাতুন এক মাসের ছুটিতে রয়েছেন। এ বিষয়ে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালক কামরুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সেখানে অনিয়মের বিষয়টি আমার জানা নেই। এ বিষয়ে কথা বলতে হলে অফিসে আসতে হবে।'